Vol. II, Issue-I, 2022

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY

PEER REVIEWED

বিদ্যাসাগরের কর্মচিন্তায় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

সারসংক্ষেপ:

"পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান"।

অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্ম্মনীতি

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ হল ধর্ম। কিন্তু ধর্ম বলতে কি বোঝানো হয়? 'ধর্ম' শব্দটি নানা অর্থ বোধক। যেমন ধর্ম বলতে নৈতিকতাকে বোঝানো হয়, বস্তু বা ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণকে বোঝানো হয়, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্মকে বোঝানো হয়ে থাকে। আবার ধর্ম বলতে রিলিজিয়ন, শাস্ত্র বিহিত কর্মকেও বোঝানো হয়। ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার মূলে রয়েছে ধর্মকে কোন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়ে অস্পষ্টতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন কর্মযোগী পুরুষ। ঊনবিংশ শতকে তাঁর আবির্ভাব। এই সময়ে ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। অন্য দিকে সমাজের এক করুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, যেমন অশিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রমুখ। মানব জীবন সীমিত সময়ের, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সীমিত সময়ের সদ্ ব্যবহার করেছিলেন সমাজের কল্যাণের জন্য। দয়াসাগর বিদ্যাসাগর ধর্ম্মকে কিভাবে দেখতেন? ধর্ম্ম সম্পর্কে কেন তিনি পরিষ্কার কোন মত প্রকাশ করেন নি? না কি ধর্মকে তিনি রিলিজিয়ন অর্থে গ্রহণ না করে অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। কর্মবাদী পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মচিন্তায় ধর্মের স্থান বা প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

মূলশব্দ : ঈশ্বর, আস্তিক, নাস্তিক, কর্মবাদ, ভাববাদ প্রমুখ

ভূমিকা:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র। ঊনবিংশ শতকের যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে – বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন।"১।

সত্যই করুণাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন যথার্থ মানুষ। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে ভারত তথা বাঙ্গলার সমাজে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম ও প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রাম চলছে। ঊনিশ শতকের বঙ্গদেশে এই নবজাগরণে তিনি আত্মতেজের মহান অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, গ্রামীণ সংস্কারবিজরিত পটভূমিকায় লালিত হয়ে এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ঐতিহ্যানুযায়ী শিক্ষাদীক্ষার অনুশীলন করে তিনি যে কীভাবে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম, লোকহিতৈষণা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতাবাদের অনুরূপ মানুষের কল্যাণচিন্তা নিজের অন্তর্লোকে স্থাপন করলেন, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে যে কর্মবাদ, মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল তার একজন পুরোধা হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

তিনি নিজের জীবনে কর্মকেই মূল স্থান দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “”বিদ্যাসাগরের কর্ম্মশক্তি ছিল অপূর্ব্ব। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত হইল। তিনি ভাবুকের ন্যায় শুধু স্বপ্ন দেখিতেন না, - তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে কাজ অন্যের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন”[২]। কর্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জ্ঞানযোগী বিদ্যাসাগর যেন নরনারায়ণের সেবার মাধ্যমেই তার কর্মযোগসাধনা করে গেছেন। এহেন স্পষ্টবাদী, মানবদরদী যথার্থ একজন মানুষের একটি বিষয় নিয়ে তাঁর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি; সেই বিষয়টি হল তাঁর ধর্মসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে এতো জল্পনা কল্পনার কারণের মূলে রয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিস্ময়কর নীরবতা। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন, “জীবনে একটি বারের জন্যও তিনি ধর্ম বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেননি। ঘরোয়া বৈঠকেও না”[৩]। কিন্তু কেন এই নীরবতা? কথায় আছে – “Silence is not empty, it is full of answers”. সত্যই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম সম্পর্কে নীরবতা অনেক কিছুর উত্তর দিয়ে থাকে। এই প্রবন্ধে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নীরবতার কারণ অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে দেখা হয়েছে কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের কর্মচিন্তার সঙ্গে তা কতটা প্রাসঙ্গিক?

কর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা :

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ বাংলা সংস্কৃতিতে ধর্মচিন্তায় এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের দুর্বলজাত সংহতির সুযোগে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের পথ সুলভ করেছিল। নব্য বাঙালীর মন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তখন উৎকেন্দ্রিক হয়েই রয়েছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের ইন্ধনে একশ্রেণীর বাঙালীর সাহেব হওয়ার স্বপ্ন অতি সহজেই সফলতা লাভ করলো। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠীর গোঁড়ামির ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এই দুটি শক্তির টানা পোড়েনে তৃতীয় এক শক্তির উদ্ভব ঘটল বাংলাতে এবং তাঁরাই ঊনবিংশ শতকে বাংলা সংস্কৃতির যথার্থ রক্ষকরূপে স্বীকৃতি পেলেন। এই তৃতীয় শক্তির পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতকের এই রূপ ধর্মীয় কোলাহলপূর্ণ সমইয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। ঊনবিংশ শতকের এই ধর্মীয় কোলাহল পূর্ণ পরিবেশে সমাজেরও করউণ অবস্থা ছিল, যা প্রত্যক্ষকৃত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন শিক্ষার আলোতেই সমাজের অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে। তাই তিনি ধর্মীয় কোলাহল ঠেকে দূরে ঠেকে সমাজসংস্কারে ব্রতী হন[i]।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন – “বিদ্যাসাগর এমন একজন মানুষ যার মনীষা প্রাচীন ঋষিদের মতো, কর্মদক্ষতা ইংরেজের মতো এবং হৃদয়বত্তা বাঙালী জননীর মতো”[৪]। কর্মের বিস্তার ও বিচিত্রতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্য চারটে বাঙালীর চিন্তাকে ছাড়িয়ে যায়। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে

তিনি দক্ষিণ বাংলার চারটি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজও করতেন। এই সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করেন। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ দায়িত্বে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করতে বর্ণপরিচয় থেকে বোধোদয়, কথামালা প্রমুখ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজসাধ্য করার জন্য উপক্রমনিষা ও ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিধিবদ্ধ করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন পাস করতে বাধ্য করান। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল অবহেলিত মানুষই তাঁর সেবার পাত্র ছিল। কর্মাটাঁড়ে থাকাকালীন সময়ে সেখানকার অবহেলিত মানুষদের সেবায় কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে আর্তত্রাণের কাজে ডাক আসতো, তখন তিনি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থা করতেন। এই সকল কাজের মূল প্রেরণা ছিল তাঁর মানবপ্রীতি। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন বলেছেন, “বিদ্যাসাগরের কর্মযোগের আদর্শ ছিল – দম্যতাম, দয়স্ব, দদস্ব (দান্ত হও, দয়ালু হও, দানশীল হও)”[৫]।

এবারে আসা যাক ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কি চিন্তাভাবনা ছিল? “ধর্ম” শব্দটির অর্থ ধারণ করা। যা সমাজকে ধারণ করে বা রক্ষা করে তাই ধর্ম। সাধারণ মানুষের কাছে ‘ধর্ম’ শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে দেখা যায়। এখানে ধর্ম বলতে Religion বা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মকে বোঝানো হয়ে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চুপ বলতে মূলত এই ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। বিদ্যাসাগর আস্তিক না নাস্তিক, না কি সংশয়বাদী – এই নিয়ে একাধিক বির্তক আছে। বিদ্যাসাগরকে

নাস্তিক বলে প্রথম প্রচার করেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য[ii]। তবে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে একাধিক যুক্তি আছে। ঈশ্বরবিশ্বাসের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা "বাসুদেব চরিত" এ ভাগবত অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা, ভূগোল-খগোল বর্ণনায় ঈশ্বর প্রসঙ্গ বা তাঁর 'গোপাল স্তুতি'র উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর 'আখ্যানমঞ্জুরী' গ্রন্থে ধর্মভীরুতা, ধর্মপরায়ণতা, ধর্মশীলতার পুরস্কার, ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা, এছাড়া 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' প্রভৃতি রচনায় নানানভাবে ধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে। তাঁর লিখিত একাধিক পত্রাবলীর দিকে দৃষ্টি দিলেই একথা পরিস্কার হয়ে যায়। "সুকিয়া স্ট্রিটে ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়িতে বসে পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে একখানা চিঠি লিখছেন বিদ্যাসাগর। লেখা হয়ে যাবার পর চন্দ্রমোহন একবার চিঠিখানা দেখতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন – তুমি যা ভাবছ, তা নয়। এই দ্যাখো, 'শ্রী শ্রী হরিঃ সহায়:' লিখেছি"।৬ এই একখানা চিঠিতে নয়, আরো অনেক চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন 'শ্রী শ্রী দুর্গা শরণং', 'শ্রী শ্রী হরিঃ সহায়ঃ' প্রমুখ। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি চিঠিতে ঈশ্বরের নাম এমন ভাবে কেউ লিখতে পারে? এছাড়া দেখা যায় 'বোধোদয়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তবে এতৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে তিনি ঈশ্বর বিষয়ক কোন মন্তব্য করেননি। বরং রসিক বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর প্রসঙ্গে বেতের কৌতুকপূর্ণ গল্পটি খুব প্রসিদ্ধ। রামহরি পাল নামক এক কবিরাজ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা মহাশয় এই যে শাস্ত্রেই মুক্তির কথা দেখতে পাই, সে মুক্তিটা কি

রকম? বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কবিরাজ মহাশয় আবার সেই প্রশ্ন করিলেন, সেবারও বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি চারিবার জিজ্ঞাসিত হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, কেন বাবু আর এই বুড়া বামুনকে বেত খাওয়াবে? ঐকথা শুনিয়া কবিরাজ মহাশ্য অপ্রতিভ হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন – সে কি মহাশয়, আমি আপনাকে বেত খাওয়াবো কিরূপে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, তা নয়ত কি? ও মুক্তি, নির্ব্বাণ, পরলোক, স্বর্গ, নরক সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা আছে, তুমি তাই নিয়ে থাক – আমার যা ধারণা আছে, আমি তাই নিয়ে থাকি। মুক্তি সম্বন্ধে আমার যা বিশ্বাস আছে, সেটা হয়তো ভুল বিশ্বাস। এই ভুল বিশ্বাসের ফলে ম'লে পর যখন যমের বাড়ী যাব, তখন চিত্রগুপ্ত বলবে - বুড়া বিট্‌লে, মুক্তি সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা? দাঁড়াও তোমার ধারণা ঘোচাচ্ছি। এই বলেই একটা যমদূতকে হুকুম কর্ব্বে লাগাও বুড়াকে বিশ বেত। যমদূত এসে আমাকে শপাশপবেত লাগাবে। এমন সময় হয়ত তুমি সেখানে গিয়ে হাজির হলে, চিত্রগুপ্ত যখন তোমাকে মুক্তির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা কর্ব্বে তখন তুমি আমার মুখে যা শুনবে তাই বলবে। চিত্রগুপ্ত যখন জিজ্ঞাসা এ তত্ত্ব কার কাছে শুনেছিলি? তখন তুমি আমাকে দেখিয়ে বলবে 'উনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন'। চিত্রগুপ্ত তাই শুনে আমাকে বলবে বটেরে বিট্‌লে বামুন, নিজেও মজেছ আবার পরকেও মজিয়েছ? এই বলেই যমদূতকে হুকুম কর্ব্বে লাগাও বুড়োকে আর বিশ ঘা। তা বাপু আমি একে নিজের বেতের ঘায়ে জ্বলে মরছি, তাঁর উপর তুমি আবার কেন বেত খাওয়াবে? ওসব নিজে

বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার ক্রে যা ভাল বোঝ তাই কর, অন্য লোককে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করে আর ফ্যাসাদেফেল না"৭। এইজন্য তিনি আস্তিক, না নাস্তিক, না কি সংশয়বাদী? – এই প্রশ্ন উঠা অবান্তর। মুল কথা হল তিনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্ম সম্পর্কে নীরব থাকতে চেয়েছেন। কারণ তিনি প্রত্যক্ষবাদী মানুষ ছিলেন। ভাব নিয়ে ভাবনার করবার অবসরই তাঁর ক্রিয়াশীল জীবনে ছিল না। "বিদ্যাসাগর জীবন ও জগৎকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। জগতের পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ দুঃখ তাঁহার নিকট অপ্রত্যক্ষ আত্মা বা ঈশ্বরের চেয়ে অধিকতর সত্য ছিল। ইহাই বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষবাদ, ইহার সহিত ভোগবাদের কোন সম্প্ররক নাই"৮।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্ম সম্পর্কে নীরব থাকলেও, দু-একটি ক্ষেত্রে ধর্মসংক্রান্ত তাঁর নিজ মত জ্ঞাপন করেছেন। যেমন, মাস্টার(শ্রীম, রামকৃষ্ণকথামৃতের রচয়িতা) একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে? তিনি বলিয়াচ্ছিলেন, "আমার বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই। ......মাস্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, তাঁকে তো জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য – আমাদের নিজেদের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়"৯। 'এরূপ' মানে আমাদের কল্পনা বা ধারণাতে ঈশ্বরের যে মঙ্গলময় রূপ থাকে সেইরূপ অর্থাৎ মানুষের সেইরূপ মঙ্গলময় কর্ম করা উচিত। সুতরাং

তাঁর কাছে ধর্ম সকল কিছুর মূল হওয়া উচিত সমাজের মঙ্গল। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পূর্বে যে অন্ধকারময় সমাজ, বিদ্যাসাগর সেই অন্ধকারময় সমাজে দাঁড়িয়ে সমাজের মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুকে মহত্তর হিসাবে দেখতে চাইচ্ছেন না। তাই তাঁর কাছে জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতে হবে এবং জীবহিতব্রতই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হওয়া উচিত। তাই দেখতে পাওয়া যায় বারবার ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপ সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যাসাগরের মনকে আলোড়িত করেছিল। নানা দেশের অসংখ্য নরনারী সমেত 'স্যার জন্ লরেন্স' নামে ষ্টিমারটি যখন জলে ডুবে গেল, তখন তিনি মঙ্গলময় ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন, "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর, যে নানা দেশের অসংখ্য লোককে একত্র ডোবালেন! আমি যা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হয়ে কেমন করে এই ৭০০/৮০০ লোককে একত্র এক সময় ডুবিয়ে ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বেলে দিলেন? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এসব দেখলে কেউ মালিক আছেন বলে বোধ হয় না"[১০]।

এছাড়া অপর একটি বক্তব্যের মধ্যে দিয়েও তাঁর ধর্ম সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পায়। কাশীধামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন – "আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই, তবে এইকথা বলি, গঙ্গাজলে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম"[১১]। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের কাছে ধর্ম হল পবিত্রতা, পবিত্র ও শুদ্ধ চিত্রে কাজ করাই পরম

ধর্ম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ব্যাপ্ত থাকতে চান নি। কারণ তাঁর কাছে ধর্ম সমাজের মঙ্গলময় কর্ম।

দর্শন সম্বন্ধীয় চিন্তা :

মানবদরদী ঈশ্বরচন্দ্রের দর্শন সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনা পাওয়া যায় – তাতেও তাঁর বাস্তবাদী, সমাজের মঙ্গলময় কর্মে বিশ্বাসী রূপটি প্রকাশ পায়। তিনি ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ বেদান্তের এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ সালে শিক্ষা পরিষদের সচিব এফ আই মৌআট-কে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছিলেন –“বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন যে ভ্রান্ত দর্শনতন্ত্র তা আর বিবাদের বিষয় নয়। ভ্রান্ত হলেও এই দুটি দর্শনতন্ত্র হিন্দুদের অপরিসীম শ্রদ্ধার অধিকারী”[১২]। এছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর নব্যন্যায়ের পাঠ খর্ব করেন। তাঁর শিক্ষাসংস্কারের প্রথম কাজটিই ছিল সংস্কৃত কলেজের নব্যন্যায়ের ভাগ কমিয়ে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনতন্ত্র(বৌদ্ধ ও জৈন) ও আধুনিক ইওরোপীয় দর্শন(বেকন, মিল) পড়ানো শুরু করা। এই কারণে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দুঃখ করে লিখেছেন, “পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নব্যন্যায়ের প্রতি অত্যন্ত পরাঙ্‌মুখ ছিলেন”[১৩]। সুতরাং শুধু নব্যন্যায় বা সাংখ্য বা বেদান্ত বলে নয়, তিনি অযথা তর্ক-বিতর্ক মূলক আলোচনা বা আধ্যাত্মিক আলোচনায় ব্যাপিত থাকতে চাইতেন না। “ছাত্র অবস্থায় বিদ্যাসাগর এক সপ্তাহ ধরে পন্ডিতমশাইয়ের কাছে নব্যন্যায়ের কোন একটি মত প্রচুর খেটে বুঝলেন। পরের দিনই ক্লাস-এ ঢুকে সেই পন্ডিতমশায়

প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো – এ মতটি পূর্বপক্ষমাত্র, এবার আমাদের দেখতে হবে এটি ভুল। সেই থেকেই নব্যন্যায়ের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অশ্রদ্ধা হয়ে গেল”[১৪]। বাদী-প্রতিবাদীর আলোচনা বা আধ্যাত্মিক, পারলোকিক আলোচনা থেকে তাঁর কাছে অধিক শ্রেয় বাস্তববাদী সমাজমূলক দর্শন চর্চা যা বুদ্ধি বিকশিত করবে এবং একই সঙ্গে সমাজের মঙ্গলময় কর্মে প্রেরণা দেবে। ১৮৫২ সালে বেনারস সংস্কৃত কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ ব্যালেনটাইনের উপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়। তখন ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুমোদন করেন। এর প্রতিবাদ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, “বার্কলের বই পড়ালে সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না। কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মতো বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন"[১৫]। ভাববাদী বার্কলের মতে অনুভূত হওয়ার মধ্যেই বস্তুর অস্তিত্ব নিহিত। অর্থাৎ অনুভবকারী মনের বাইরে বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই। এইকারণেই তিনি সাংখ্য, বেদান্ত ও বার্কলেকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন; এইসকল দর্শনচর্চাতেই ভাববাদী প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মিলের দর্শন, কোঁমৎ-এর দর্শনে আগ্রহী ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, “হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসি দেশ প্রসিদ্ধ কোমৎ দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত”[১৬]। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য “বিদ্যাসাগর : নানাপ্রসঙ্গ” গ্রন্থে যর্থাথই বলেছেন, “সংস্কৃত কলেজে দর্শনবিভাগের পাঠক্রম সংস্কার থেকে শুধু বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তাই ধরা পড়ে না, তাঁর নিজস্ব দার্শনিক বিশ্বাসও ফুটে

ওঠে। .... তিনি চান আধুনিক দর্শন – বেকন এর আরোহী (Induction) যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, আর নব্যন্যায়ের বদলে মিল-এর বই, A system of Logic"[১৭]। এখন প্রশ্ন হল পাশ্চাত্যের এত দার্শনিক থাকতে বিদ্যাসাগর স্টুয়ার্ট মিলের লজিক পড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর মিলের দর্শনের মধ্যেই রয়েছে। মিল ছিলেন মূলতঃ ইমপিরিসিস্ট এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি মনে করতেন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের বাইরে অলৌকিক কিছু নেই। আবার অন্য সাম্রাজ্যবাদীগণ (Imperisist) সংকীর্ণ অর্থে ঐহিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত ভোগসুখকেই জীবনের সার বলে মনে করেছিলেন। পক্ষান্তরে মিল দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিকবোধের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে মিল বলেছেন, "It would be a great misunderstandingof this doctrine to suppose that it is one of selfish indifference which pretends that human beings have no business with each other's conduct in life and that they should not concern themselves about the well-doing or well being of one another, unless their own interest is involved. Instead of any diminution, there is need of great increase of disinterested exertion to promote the good of others"[১৮]. দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগরের দর্শন চিন্তার সঙ্গে মিলের দর্শনের সাদৃশ্য ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মিল-এর লজিক পড়ানো এবং অধ্যাত্মবাদী

প্রাচ্য দর্শনের পাঠ্যসূচী খর্ব করার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের নিজের চিন্তা ও ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার :

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে এই সকল চিন্তা-ভাবনা থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি ভাববাদী জগতে কখনও বিচরণ করতে চান নি। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কথিত আছে গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না, বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শন বলেই প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব কখনই 'ঈশ্বর' সংক্রান্ত আলোচনা করেন নি, মানুষের দৈনন্দিক সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ খুব সুন্দর করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিল – আপনি আমাদের যে শিক্ষা দিলেন, তাতে কোথাও তো ঈশ্বরের কথা বলছেন না, তার মানে কি আমরা বুঝব ঈশ্বর নেই। বুদ্ধ বললেন, আমি কখনো বলেছি, ঈশ্বর নেই? তখন প্রশ্ন করা হল – তাহলে কি আমরা বুঝব, ঈশ্বর আছেন? বুদ্ধ বললেন : আমি কি কখনো বলেছি, ঈশ্বর আছেন? তিনি বললেন, ঈশ্বর আছেন কী নেই, বেদ আমাদের জীবনে কতখানি প্রাসঙ্গিক – এগুলি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তোমার কি প্রয়োজন, সমাজের কী প্রয়োজন, তোমার পরিবারের কি প্রয়োজন, তোমার চারপাশের মানুষের কী প্রয়োজন? এগুলিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর থাকলে থাকবেন, তাতে তোমার কী? ঈশ্বর ছাড়া কোনোদিন আমাদের চলছে না – এমন কখনো হয়েছে কি?.............. তোমার

সামনে যে সমস্যা সেটির সমাধান তোমাকে করতে হবে। যেভাবে চললে তুমি এইসব সমসযার সমাধান করতে পার, তুমি তাই কর"।[১৯] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই একই ধরণের মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। তিনিও ঊনবিংশ শতকে সমাজ সংস্কারমুলক কাজকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, ঈশ্বর বা ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চান নি।

কর্মই তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও ধর্ম। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাতে তা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন জীবনের শেষে দুটি বছর তিনি অসুস্থতায় ভোগেন। এই অসুস্থতার কারণে কলকাতা থেকে দূরে চন্দননগরে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। জীবনের শেষ সময়ের বিভিন্ন কথা পাওয়া যায় যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে। যোগেন্দ্রকুমার প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি যেতেন, সেখানে দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চেয়ারে বসতেন তাতে একটুও ময়লা ছিল না। একবার চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ এরূপ পরিষ্কার আছে কিভাবে? এই প্রশ্ন করাতে বিদাসাগর মহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি কখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসিনে তা চেয়ারে ময়লা লাগবে কেমন করে? হেলান দিয়ে বসলে শিরদাড়া বেঁকে যায়, লোক আয়েসী হয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ হেলান দিয়ে বসলেই ইচ্ছে হয় টেবিলের উপরে পা দুটো তুলে দিই। আমি ঠিক সোজা হয়ে বসি, কখনও হেলান দিই না বা সামনে ঝুঁকে বসি না!"[২০] মনে রাখতে হবে এই সময় তাঁর বয়স ৭০। ইন্দ্র মিত্র বলেছেন "জীবনের শেষ দিনে বিদ্যাসাগরের বিষন্ন মুখ দেখে তাঁর ছেলে নারায়ণ তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'কী কষ্ট হচ্ছে?' বিদ্যাসাগরের উত্তর 'দুঃখ হচ্ছে

মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য চাকুরীজীবন অন্তে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না”২১। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে স্বর্গ, নরক প্রভৃতির কোন মূল্য নেই, মানুষের বাস্তব জীবনই তাঁর কাছে চরম সত্য[iii]। পরদুঃখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হতো বলেই তাঁর অনুষ্ঠিত কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।

এই সকল আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে বাস্তববাদী কর্মযোগী পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবনে ধর্ম হল প্রত্যক্ষকৃত সমাজের জন্য কৃত মঙ্গলময় কর্ম। যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় সেই ভাব নিয়ে ভাবনার সময় তাঁর ছিল না; তাই তিনি Religion বা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্ম নিয়ে নীরব ছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন’? এই প্রবন্ধে যর্থাথই বলেছেন, “মানুষই তাঁর ধর্ম, মানুষই তাঁর সাধনা, মানুষ তাঁর আধার এবং আধেয়। পাশ্চাত্য Positivist দার্শনিকের মতো মানবতত্ত্বের নির্যাস নয়, মানুষের দুঃখদুর্দশাপূর্ণ কবোষ্ণ স্পর্শই তাঁর কাম্য ছিল। নরের মধ্যে নরোত্তম ও নারায়ণকে তিনি দর্শন করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু নরদেহই তাঁর কাছে দেবমন্দির; নরদুঃখ লাঘবের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ তাঁর যজ্ঞহবিঃ। বিদ্যাসাগর পরম আস্তিক্যবাদী, কারন তিনি মানববাদী”২২।

i ‘ধর্মবোধ ও বিদ্যাসাগর’ প্রবন্ধে শ্রুতি মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম সংঘাতের বিবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠ মন ও মনন কিছুটা পাশ কাটিয়ে নিরলস কর্মযজ্ঞে সমর্পিত ছিল এ তথ্যের বিপক্ষে মত নেই”। (বিদ্যাসাগর স্মৃতি, সম্পাদনা বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম, কলকাতা ৭৩, ১৩৬৭, পৃ ১২৭)

ii “বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধহয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না”। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা বিমান বসু, ‘বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন’? অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পৃ ১৬২

iii “তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করিবার সাধনা করেন নাই। মানুষের দুঃখদৈন্য তাঁহার নিকট চরম সত্য ছিল”। (ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পৃ ৮৭)

তথ্যসূচী :

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরচরিত, চারিত্রপূজা, বিশ্বভারতী, ২য় সংস্করণ, ১৩৪৩, পৃ ৪৫

২) সাহিত্য সাধক চরিতমালা, দ্বিতীয় খন্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ ১২৬

৩) সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা, প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পৃ ২৩৫

৪) হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, মহামানব বিদ্যাসাগর, “বিদ্যাসাগরের স্মৃতি, সম্পাদক বিশ্বনাথ দে, সাহিত্যম, কলকাতা - ৭৩, ১৩৬৭, পৃ ৪৫

৫) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা ৬, ১৩৬৫, পৃ ৮৬

৬) শ্রীচন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা-১২, ১৯৬৯।

৭) যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিতে সেকাল, ১৯৫০, পৃ ৩৩

৮) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা ৬, ১৩৬৫, পৃ ৯০

৯) রসসাগর বিদ্যাসাগর, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দেজ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ ৫২

১০) চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পৃ ৫২২

১১) বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ৪র্থ সংস্করণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-৭, ১৯৮৬ পৃ ৪৮৬

১২) বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩, পৃ ৫৩০

১৩) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ৩১৬

১৪) বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯২, পৃ৩২

১৫) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে, প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, পৃ ১২৮

১৬) প্রবন্ধাবলি, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা বিমান বসু, ১৯৬০, পৃ ২২

১৭) রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর : নানা প্রসঙ্গ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা ৭৩, ২০১১, পৃ ১১৫

১৮) John Stuart Mill, Utilitarianism, 1962, p 132

১৯) স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ধর্মের শিক্ষা, উদ্বোধন, শারদীয়া ১৪২৮, ১২৩তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃ ১২৬

২০) স্মৃতিতে সেকাল, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ ২০

২১) ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, ১৩৯২, পৃ ৫৮৩

২২) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন', প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, পৃ ১৬৯